Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXVIII, June 2021

এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার 'স্থান-ভিত্তিক' ও 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাব্যতা: মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি ন্যায্যতা প্রতিপাদন

রাশেদা খাতুন*

[**সার-সংক্ষেপ:** পরিবেশ নীতিবিদ্যায় দুটি ধারা প্রচলিত; এর একটি মানবকেন্দ্রিক এবং অন্যটি অমানবকেন্দ্রিক। পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষ এবং প্রকৃতিরআন্তঃসম্পর্ক মূল্যায়ন করে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতিতে একটি মান-নির্ণায়ক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার ধারা বা তত্ত্বের পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রাচ্য সংস্কৃতিতে 'মানব প্রকৃতি'র সম্পর্ক কিরূপ? এবং প্রাচ্য সংস্কৃতিতে কোন ধরনের নীতিবিদ্যা বিরাজ করে? এসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধটি আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এশীয় জনগণের (মানব সমাজের) জীবন ব্যবস্থা, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' সহায়ক কিনা তা এশীয় তিনটি সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য উল্লেখপূর্বক বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রাচ্য বা এশীয়দের নিকট প্রকৃতি হলো সংহতি ও আত্মিকতার ভিত্তি। এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় 'মানব প্রকৃতি'র আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা করে এশীয় পরিবেশবাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা যাচাই করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।]

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকট সমাধানের সাথে পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে পরিচিত। এটি একটি মান-নির্ণায়ক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। প্রকৃতির মূল্য নির্ধারণ করা পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি মূল বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত এটি পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অন্য কথায়, পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির সাথে আমাদের কিরকম সম্পর্ক হওয়া উচিত অথবা প্রকৃতির সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত অর্থাৎ পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণকে মূল্যায়ন করা, যথার্থ আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং পরিবেশ

* **রাশেদা খাতুন :** প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সংরক্ষণে মানুষের কী করণীয় সেসম্পর্কিত কিছু নির্দেশনা প্রদান করে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তিকী হবে? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন পরিবেশ নীতিবিদ্যায় দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের উদ্ভব হয়েছে।যথাঃমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Anthropocentric theory) এবং অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Non-Anthropocentric theory)। পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুরই মূল্য আছে এবং পরিবেশ তখনই মূল্যবান হয়ে উঠে যখন পরিবেশের যাবতীয় কিছু মানুষের উপকারে আসে। পরিবেশের এরূপ অর্থ মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব বা মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে নির্দেশ করে। বিপরীতভাবে, প্রকৃতির সব কিছুর স্বতঃমূল্য রয়েছে, পরিবেশকে যখন আমরা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের প্রেক্ষিতে মূল্য দেই এবং মানুষের উপকারে আসুক বা না আসুক প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের অন্তঃর্নিহিত মূল্য রয়েছে বলে স্বীকার করি; পরিবেশ নীতিবিদ্যার এরূপ অর্থকে অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব বলে। উল্লেখ্য, সকল কৃষ্টিগত ঐতিহ্য তাদের নিজস্ব মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে প্রতিপালিত করে এবং প্রকৃতিকে মানবকেন্দ্রিক অথবা অমানবকেন্দ্রিক শ্রেণি বিভক্ত করে তাদের সংস্কৃতি তৈরি করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব এবং অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্বের মধ্যে বিশদ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।পরিবেশ নীতিবিদ্যায় লক্ষ্য করা যায়,পরিবেশ সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান মনোভাব প্রকৃতির দিকে যা যথাযথ নয় কেননা পরিবেশবিদগণ এটিকে মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা হিসেবে উপস্থাপন করেন। নৈতিকতার যেসব সূত্র প্রচলিত তার অধিকাংশই মানবকেন্দ্রিক (Human centred)। কারণ, মানুষের স্বার্থে পরিবেশকে রক্ষা করা উচিত মর্মে পরিবেশের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক ধারার এক শ্রেণির পরিবেশবিদ প্রাকৃতিক বা পরিবেশের মূল্য নির্ধারণে প্রচলিত নৈতিকতা থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করার কথা বলেন, তারা মনে করেন পরিবেশের প্রতি জাঁহাবাজ (dominating)মনোভাবের সংশোধন ব্যতিত প্রকৃতির সাথে অমানব প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়পূর্ণ যুগপৎ অবস্থান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পরিবেশের প্রতি মানবিক আচরণের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা, যাতে করে এই সংকট দূরীকরণ সম্ভব হয়, এটি পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। এহেন লক্ষ্য অর্জনে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় যে অমানবকেন্দ্রিক ধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, এ প্রসঙ্গে আর্লবার্ট স্যুইটজার (Albert Schweitzer), আলডো লিউপোল্ড (Aldo Leopold), আর্নে নায়েস (Arne Naess), পল টেলর (Paul Taylor), হোমস্ রলস্টন (Holmes Rolston) এবং আরনেস্ট প্যাট্রিজ (Ernest Partridge) এর মত বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা যায় তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে 'বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান'(Ecological Wisdom) উপলব্ধি করেছেন। J. Baird Callicott এবং Roger T. Ames নামে দুইজন সমসাময়িক পরিবেশবাদী দার্শনিক

এশীয়সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে 'ধারণামূলক সংস্থান'(conceptual resources) অবতারনা করেছেন, যাপরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যথার্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অমানবকেন্দ্রিক মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 'মানব প্রকৃতি'রআন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। 'মানব প্রকৃতি'আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরসম্ভাবনা প্রসঙ্গে এশীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এশীয় সংস্কৃতি বিচিত্র এবং ভিন্নধর্মী। চৈনিক, ভারতীয় এবং জাপানিজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরে এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে মানবকেন্দ্রিক বা অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্বের কোনো দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে বরং একটি নতুন তত্ত্বের সম্ভাব্যতা আলোকপাত করা হয়েছে। এশীয় সংস্কৃতিতে এক বিশেষ ধরনের পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিদ্যমান রয়েছে বলে অনেক চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিক মনে করেন। এই বিশেষ ধরনের পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো 'স্থান-ভিত্তিক'(Place-based) এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' (Kin-centric) নীতিবিদ্যার সম্ভাব্যতা। তালুকদার (Talukder) 'স্থান-ভিত্তিক' (Place-based) এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' (Kin-centric) নীতিবিদ্যার ধারণাটি তার Nature and Life গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সংস্কৃতি উল্লেখপূর্বক 'স্থান-ভিত্তিক '(Place-based) এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' (Kin-centric)পরিবেশ নীতিবিদ্যার সম্ভাব্যতার ধারণা প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছি, যা পরিবেশের প্রতি নৈতিক তাৎপর্যকে ইঙ্গিত প্রদান করে।

'মানব প্রকৃতি' সম্পর্কে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য:

সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবন প্রণালী আর ঐতিহ্য হলো জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথা, অনুশীলন রীতির মনোভাব, সেই সাথে পৃথিবী এবং তার বাইরের বিষয়ের প্রতি জীবনের অনুভূতি যা সময়ের বিবর্তনে মানবজাতি দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। সাধারণত সম্প্রদায়গুলো ঐতিহ্যকে ভাঙ্গতে চায় না, যেহেতু এই ধরণের ভঙ্গুরতা বিদ্যমান থাকা 'সঙ্গতি' (harmony) কে ধ্বংস করতে পারে এবং নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে।ঐতিহ্যকে হারানোর পরিবর্তে মানবজাতি বরং এগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে রাখাকেই শ্রেয় মনে করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য, কলা, দর্শন এবং মূল্যের ক্ষেত্রগুলোতে সর্বদা সহজলভ্য জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করা- এটি সঠিক কিনা?বলা বাহুল্য সংস্কৃতির মাধ্যমে যেকোন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়। তাসত্ত্বেও প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কটা সরল নয়। সম্ভবত, এই সম্পর্কটা হয় খুব গভীর কারণ'মানব প্রকৃতির' 'বিচ্ছিন্নতা'র মূল কারণ হিসেবে সংস্কৃতির শিষ্টাচার অনেকটা দায়ী।লক্ষ্য করার বিষয়, মানুষ প্রকৃতিতেকৃষির উপর একটা সময়প্রভূত্বমূলক আচরণশুরু করেছিল যা Toadvine এর ভাষায় আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণদিক (Talukder 2018, 49)। Toadvine এর ভাষায়,

> Cultivation is the first and essential step toward civilization, the fundamental human manipulation of nature that makes all later technological and social development possible...Agriculture is at the edge-the margin, the barbarian frontier-of culture. (Toadvine 2007 : 209)

উল্লেখ্য Toadvine এর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, সংস্কৃতি এবং মানবসভ্যতা উভয়ই প্রকৃতির প্রতি খুব বিপদজনক পন্থা হিসেবে কাজ করেছে।সাংস্কৃতিক অনুশীলন মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি সীমারেখা (boundary) অথবা বিভক্ত(dividing) রেখা প্রতিষ্ঠিত করেছে। যা Toadvineএর বক্তব্যের অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।Oelschlaeger এটিকে "the great Divide" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবনে 'সীমার' অভিজ্ঞতাকে "একটি ডিমের খোসা" (the shell of an egg)অর্থাৎ উপমা অর্থেআমাদের নিজের গায়ের চামড়া হিসেবে (our own skin)Brownকর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে।তাছাড়া মানুষ নিজেদের মধ্যে কিছু ভিন্ন 'সীমা' তৈরি করেছিল। যেমন- প্রযুক্তিক সীমা। প্রযুক্তি আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান। তবেপ্রযুক্তি প্রকৃতি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে কারণ আমরা শুধু অন্য প্রাণির প্রতি যেমন- জীব-জন্তু এবং গাছপালার উপর প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থন করে থাকি।সীমা বর্ণনা করার জন্য আমরা প্রায়ই কিছু শব্দ ব্যবহার করি যেমনঃ"high tech society" "computer technician"।এখানে সীমা বা গন্ডীকে বজায় রাখার জন্য কিছু কার্যকারিতা বা উপকারিতা রয়েছে। সংরক্ষণবাদীদের জানা প্রয়োজন যে, তাদের একটি সংহতিপূর্ণ পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'মানব প্রকৃতি' সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের ধরণ প্রকাশ করে। এর কারণ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনকরা এবং এর মূল্যের উপর গুরুত্বারোপ করা। (Talukder 2018, 50)

এশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে 'মানব প্রকৃতি':

এশীয় মানুষ, প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্ককে কীভাবে উপলব্ধি করে? এশীয় সংস্কৃতিতে 'প্রকৃতির' অর্থ কি? Callicott ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে কোনো সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিহয় অনুধাবনমূলক এবং জ্ঞান সুদৃঢ় করণে মৌলিক যা অন্য সংস্কৃতির জন্য সহায়ক।এশীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে কিছু মূল ধারণা আলোচনা করা প্রয়োজন। তার মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা হলো প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণধারণা। বলা যায় এশীয় সংস্কৃতিতে 'ঈশ্বর এবং প্রকৃতি' এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য না হলেও তিনি মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকৃতিকে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য পরাধীন করেছেন। ঈশ্বর চরম সত্য, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এশীয় কিছু সংস্কৃতিতে

মানুষ প্রকৃতিকে সম্প্রসারিত পরিবারের মতই মনে করে।এশীয় অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যেটি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভক্ত করে না, মানুষ অবশ্যই প্রকৃতির সাথে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, ব্যক্তি, সমাজ এবং রাজনৈতিক সংহতি অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া তারা বিশ্বাস করে যে, এখানে কোন ঈশ্বর নেই অথবা ঈশ্বর এবং প্রকৃতি চিহ্নিত নয়। প্রকৃতির এই একক মিশ্রণ ধর্ম, জীবন এবং দর্শন অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করে, যেটি বিশুদ্ধরূপে যৌক্তিক, যুক্তিসঙ্গত, তাত্ত্বিক এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে যৌক্তিক শব্দ।এছাড়াও, মানুষ ও প্রকৃতির কল্পনায় এশীয় ধারণায় বিভিন্ন ধরণ প্রতিফলিত হয়।এশিয়ার প্রধান সংস্কৃতি হলো চৈনিক, ভারতীয় এবং জাপানিজ। ভারতীয় এবং চৈনিক সংস্কৃতির পাশাপাশি জাপানিজ সংস্কৃতিতে প্রকৃতি সম্প্রসারিত পরিবার হিসেবে এবং প্রকৃতির সাথে কিভাবে সংহতি অর্জন করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করব।

চৈনিক সংস্কৃতিতে ‘মানব প্রকৃতি’:

সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবন প্রণালী। চৈনিক সংস্কৃতিতে‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ হলো একধরনের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, যেখানে কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর নেই। প্রকৃতি নিজেই স্রষ্টা হিসেবে গণ্য হয়না। বরং চৈনিক বিশ্ব ভাবনায় প্রকৃতি হলো ক্রমাগত, প্রগতিশীল এবং নিজেই উৎপাদিত। প্রকৃতির সকল প্রাকৃতিক উপাদান হয় স্বর্গীয়(Heaven), জাগতিক এবং প্রকৃতি হলো ‘স্বর্গ’ এবং পৃথিবীর মিথস্ক্রিয়া। প্রকৃতির সকল সজীব এবং নির্জীব উপাদান সাংগঠনিক প্রক্রিয়াদ্বারা সৃষ্টি হয়েছে (Talukder 2018 : 54) ।

Julia Tao বলেছেন,

> The Chinese have a conception of nature as an organic process, a spontaneously self-generating life force. This life force possesses continuity, wholeness and dynamism. Nature is life-giving, it gives rise to the life, flourishing and development of the myriad creatures. (Tao 2005 :71)

প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল, গতিশীল এবং স্বত:স্ফূর্ত যা মানুষের নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করে। মানুষ শুধু বিঘ্ন ঘটাতে পারে, যদি তারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। প্রকৃতিতে ঠিকভাবে ভারসাম্য ছিল যখন এটি প্রথম বিবর্তিত হয়েছিল। চৈনিক সংস্কৃতিতে তাদের সকল ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণগুণাবলী এবং বদান্যতাকে চর্চা করার প্রয়োজন মনে করে। মনে করা হয় যে, কোন আইন হলো প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ‘সংহতি’ (harmony) কে ধ্বংস করার কারণ। তাই মানুষের অবশ্যই নৈতিকতার চর্চা করা উচিত। কনফুসিয়াস হলেন চৈনিক ঐতিহ্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন চিন্তাবিদ। তিনি ব্যক্তিগত, পরিবার, সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে নৈতিকতার

চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কনফুসিয়ান অর্থে নৈতিকতার চর্চা একজন কে সত্যিকার মানুষ হিসেবে তৈরি করে।

চৈনিক সংস্কৃতিতে ভারসাম্য হলো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এবং সঙ্গতি হলো এটির সার্বজনীন পথ। বলা বাহুল্য চৈনিক ঐতিহ্যে যখন ভারসাম্য এবং সঙ্গতি উভয়ই উচ্চতর মাত্রা হিসেবে প্রাধান্য পায়, তখন স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে যথাযথ শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সকল উপাদানই বিকশিত হয়। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে।সঙ্গতি(harmony) অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে আমাদের উচিত মানবজাতিকে উপলব্ধি করা। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কনফুসিয়ান ঐতিহ্যে মানবজাতি কেবল নিছক কোন বুদ্ধিমান, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীব নয়। Weiming বলেছেন-

> Actually, we are an integral part of this function; we are ourselves the result of this moving power of Ch'i. Like mountains and rivers, we are legitimate beings in this great transformation.(Weiming 1998 : 113)

উইমিং (Weiming) এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমরা প্রকৃতির একটি অখণ্ড অংশ, প্রকৃতির গতির শক্তি যেমন পাহাড় এবং নদীর মতো স্বয়ং নিজেরাই এই বিশাল রূপান্তরের বৈধ সত্তা। তিনি তাঁর অন্য প্রবন্ধে কনফুসিয়াস দৃষ্টিতে মানব সম্প্রদায়ের স্পষ্ট চিত্র তৈরি করেছেন। এই'সৃষ্টি সংক্রান্ত ঐক্য' (Tao-Te-Ching) বইয়ের একটি কল্পনা যা স্বর্গ এবং পৃথিবীর উৎপত্তির নাম।(Talukder 2018,56)চৈনিক সংস্কৃতিতে গ্রেট ইউনিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে,সকল প্রাকৃতিক উপাদান আন্ত:সম্পর্কিত। 'মা' শব্দটি প্রকৃতিতে তাদের মধ্যে একটি পরিবারের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। যেটা নব্য কনফুসিয়াসবাদে স্পষ্টত উল্লেখ আছে।

> Heaven is my father and earth is my mother, and even such a small creature as Ifind an intimate place in their midst. Therefore, that which extends throughout the universe... I consider as my nature. (Taylor 1998 : 48)

কিভাবে একজনের তার পরিবারের সদস্যদের সাথে আচরণ করা উচিত? এই সম্পর্কের মৌলিক মূল্য কি? বলা যায়, একটি প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে চৈনিক ঐতিহ্যেই যথেষ্ঠ। এই পৌরাণিক কাহিনী হলো'Filial piety'(মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের যোগ্য আচরণ) যেটি চৈনিক প্রভাবশালী চিন্তাবিদ কনফুসিয়াস এবং মেনসিয়াস কর্তৃক প্রথম পরিচিতি লাভ করে। এটি এখনো চীন এবং এর কাছাকাছি দেশের প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য মূল পাঠ্য বই হিসেবে পরিচিত। এই পৌরাণিক কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র Hibiscus (shun) (গোলাপ ফুল) একজন পুত্রোচিত। যদিও তার সৎমা এবং তার পুত্র Hibiscus কে হত্যা করতে চেয়েছিল তার

বাবার মাধ্যমে। কিন্তু Hibiscus এর জীবন নিরাপদে ছিল। এখানে বাবার চরিত্র ছিল রূপক অর্থে অন্ধ কিন্তু শারীরভিত্তিক নয়।‘Blind’ শব্দটি তার নৈতিক অন্ধতা প্রকাশ করে। যেহেতু সে ইচ্ছাপূর্বক তার পুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তা সত্ত্বেও তার জীবন তিনবার হুমকির সন্মুখীন হয়েছিল। Hibiscusপরিপূর্ণভাবে তার বাবার অনুগত ছিল। এখানে মূল বিষয় হলো পৌরাণিক কাহিনীর নৈতিকতা যা সন্তানোচিত দায়িত্বের প্রতি নির্দেশ করে। এই পৌরাণিক কথার অর্থ হলো মানবসত্তার একটি দায়িত্ব তার পিতা-মাতা, ভাই ও বোনের সাথে উপযুক্ত সম্পর্ক অনুশীলন করা। এই সম্পর্কগুলোর ভিত্তি হলো মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতি এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসা। কনফুসিয়ান ঐতিহ্যে পরিবারের মধ্যে সঙ্গতি মূল ধারণা হিসেবে প্রতীয়মান হয় (Talukder 2018 : 56) ।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায় যে, সঙ্গতি অর্জনের উপায় হলো প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর প্রতি একধরণের আবেগপ্রবণ বন্ধন তৈরি করা। কিন্তু এটি দ্বারা প্রকৃতি অনুগামী (following nature) অর্থ বোঝায় না। এটির সরল অর্থ হলো মানুষের উচিত তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। চীনের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, চৈনিক দর্শনের মূল বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা। বলা বাহল্য চৈনিক দর্শনের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব রয়েছে। কথিত আছে চীন চারটি সমূদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। ঠিক তেমনি চীনের ভূ-প্রকৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ছিল। চীনের ভূমি ছিল বিশাল প্রকৃতির এবং এই ভূমিই তাদের কাছে জগতের মতো। চৈনিকরা সমুদ্রকে বেশি প্রাধান্য দিত। চীনের দর্শনে কনফুসিয়াস, মেনসিয়াস এর প্রভাব রয়েছে। তাঁরা উভয়ই সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজেদের জীবনঅতিবাহিত করতেন। এছাড়াও চৈনিকরা ভূমিকে অনেক ভালবাসত এবং ভূমির উপর তারা বিশাল সাম্রজ্য গড়ে তুলেছিল। চৈনিকরা কৃষির উপর নির্ভর করে তাদের জীবন নির্বাহ করত। তাদের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। Fung Yu-Lanএর মতে-“... China is a continental country, the chinese people have to make their living by agriculture”. (Fung yu-Lan 1966, 17)

চৈনিক সংস্কৃতিতে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহলো- চৈনিকরা ভূমি, সমুদ্র, কৃষি প্রভৃতি প্রকৃতির উপরই বেশি নির্ভর করত। প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্কটা ছিল আত্মিক।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ‘মানব প্রকৃতি’:

প্রকৃতি হলো ভারতীয় সংস্কৃতিতে আত্মিকতার বন্ধন। প্রকৃতির সবকিছুই যেমন: প্রাণি, গাছ, উদ্ভিজ, বায়ু, নদী,পানি প্রভৃতি হয় পবিত্র। এই ঐতিহ্যের মধ্যে বস্তুজগত এবং সজীব জগতের পার্থক্য কদাচিৎভাবে প্রতীয়মান হয়। Chattopadhyaya বলেছেন-

> In the different forms of Indian naturalism, both orthodox and heterodox, there is an intimate relation between the living world, the mental world and the natural world. All forms of life and consciousness are shaped by nature. (2003, 158)

অর্থাৎ ভারতীয় প্রকৃতিবাদের আকার ভিন্ন ধরনের। যেমন:সর্বজনগৃহীত মত এবং প্রচলিত মতের বিরোধী উভয় আকারই বিদ্যমান। এখানে সজীব, আধ্যাত্মিক এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যে একধরণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজ করে। জীবনের সকল আকার এবং সচেতনতা প্রকৃতি দ্বারা রূপায়িত।

সচেতনতা শুরু হয় জীবন্ত জিনিসের মধ্যেযা অন্য কিছুর অধীন হতে পারেনা। এটি প্রকৃতির প্রত্যেক এবং প্রতিটি উপাদানের মধ্যে উদঘাটিত হতে পারে। প্রকৃতির পবিত্রতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো গঙ্গা নদী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পানিকে সকল পাপাচারের শুদ্ধিকরণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ গঙ্গা জলে স্নান করলে শুদ্ধি হওয়া যায় এরকম একটা রীতি প্রচলিত এবং পালনীয় হয়।Coward মত প্রকাশ করেন-

> Rivers too are seen to be sacred, especially the Ganges. Hindu mythology describes the Ganges as a great goddess that originates in heaven and flows down to earth giving both food and purification.(2003, 412)

গঙ্গা নদীর উপর নির্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠান দ্বারাউপাসকমণ্ডলী কর্তৃকশুদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে 'আরতি'(Aroti) অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ।উল্লেখ্য, উপাসকমণ্ডলীর গঙ্গানদীর সাথে সনাক্তকরণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে, শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায়পূজা বা অর্চনার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তাদের সম্পর্ককে উপলদ্ধি করে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক শিষ্ঠাচার বিধিতে অনেক ধর্মানুষ্ঠান পালন করা হয়। তাছাড়া, বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই সহজাতরূপে প্রকৃতির জন্য শ্রদ্ধা সম্পর্কিত। ভারতের সকল ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দুইটি প্রাকৃতিক সাধারণ উপাদান হলো দূর্বা ঘাস এবং তুলসি গাছ। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে সজীব অথবা নির্জীব 'সৃষ্টি সংক্রান্ত ঐক্য' সকল প্রাণির বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দ্বৈততা, যেমন- মন এবং দেহ অথবা সজীব এবং নির্জীব অদৃশ্য। সুতরাং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মানুষ এবং প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা এমন যে, মানুষ হলো সন্তান এবং প্রকৃতি হলো তাদের মা। অন্য কথায় মানবজাতি প্রকৃতির সাথে (kinship)'জ্ঞাতি' সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এই মনোভাব বিভিন্ন গবেষণামূলক শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়েছে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ প্রাকৃতিক অস্তিত্বশীল উপাদানের সাথে তাদের কষ্টভোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।বিশেষ করে মাদুরাই এবং

দক্ষিণ ভারতীয় একজন নারীর সাথে একটি গাছ এবং একজন যুবক উভয়ের সাথে বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

> So, we arrange the marriage of that person to a tree, and then we pray that the tree will take on the burdens of that human being and therefore release that person from the suffering. Then the human person is free to marry someone else. Usually it works out that way. (Nagarajan 2000, 457)

যেখানে সমাজের কিছু মানুষ একজন ব্যক্তির সাথে একটি গাছের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এবং সবাই প্রার্থনা করে যে,গাছটি ব্যক্তিটির বোঝা বা ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতপর ঐ ব্যক্তিকে কষ্টভোগ থেকে মুক্তি দিবে এবং ব্যক্তিটি পরিত্রাণ পাবে।

তাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ‘মানব-প্রকৃতি’ সম্পর্ককে ধারণ করা হয়। মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যেভাবে সম্পর্কিত ঠিক একইভাবে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। এই বিশ্ব দৃষ্টিতে প্রকৃতি হলো একটি সংযুক্ত পরিবার যেটি অবিভক্ত (undivided) এবং আন্তঃসম্পর্কিত (Interrelated)। (Talukder 2018, 54) Banerjee যুক্তি দিয়েছেন-

> A joint family means that all the members of the family live together in the same house. The family does not consist of parents and children only. Presumably there is no limit to its size. (1979, 144)

সংযুক্ত পরিবার বলতে আমরা সবাই সাধারণত বুঝি যে যেখানে মা-বাবা, ভাই-বোন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য একসাথে বাস করে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণায় পরিবার শুধু রক্তের সম্পর্ক বা মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি দ্বারাই গঠিত হয় না বরং পাশ্চাত্য ঐতিহ্য থেকে এটির ব্যাপকতা বেশি। ভারতীয় ঐতিহ্যে যেবিষয়টি লক্ষ্যনীয় তাহলো ভারতীয়রা প্রকৃতিকে অধিক সম্মান করে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। বৌদ্ধ ধর্মে জীব হত্যা মহা পাপ বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন ‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রধান উৎসব হিসেবে দূর্গা পূজা পালন করা হয়। ভারতীয়রা প্রকৃতির উপর এত বেশি নির্ভর যে তারা প্রকৃতিকে পূজা করে। যেমন-বড় বড় গাছ, পাহাড়, সমুদ্র, সূর্য প্রভৃতিকে তারা পূজা করে এবং এতে তাদের মঙ্গল নিহিত বলে বিশ্বাস করে। এছাড়াও অনেক প্রাণীকে তারা ‘মা’ সম্ভোধন করে যেমন-গরু, হিন্দু ধর্মে পেঁচাকে লক্ষীর বাহন বলা হয়। অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রকৃতির সাথে এক ধরণের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে বলা যায়।

জাপানিজ সংস্কৃতিতে 'মানব প্রকৃতি':

প্রচলিত জাপানিজ ধারণায় 'মানব প্রকৃতি' সম্পর্কে প্রকৃতিকে একক ও স্বয়ং হিসেবে Watsuji tetsuroনীতিশাস্ত্রের বিস্তারকরেছেন। তিনি হলেন জাপানেরগুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বাস্তুকেন্দ্রিক দার্শনিক Nishida kitaroর সহকর্মী। জাপানিরা 'Nature'কে 'onozukara' এবং 'self' কে 'mizukara' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। প্রচলিত জাপানিজ ধারণায় 'nature' এবং 'self' এর মধ্যে ঐক্যপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রচলিত জাপানিজ দৃষ্টিভঙ্গির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হলো প্রকৃতির মধ্যে 'ঐক্য' অনুসন্ধান করা। যা 'জীবনের একত্ব এবং এর প্রতিবেশ' (oneness of life and its environment) ধারণা জাপানিজ বৌদ্ধবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। (Callicott 1989, 253)

জাপানিজ বৌদ্ধবাদে প্রকৃতির ধারণাকে আত্মকেন্দ্রিক হতে বাস্তুকেন্দ্রিক অবস্থানে একটি মৌলিক পরিবর্তনে চিত্রিত করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ সংযুক্ত হয়েছে যেটি মানবকেন্দ্রিক থেকে প্রকৃতিকেন্দ্রিক অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। (Callicott 1989 : 250)

সুতরাং প্রচলিত জাপানিজ মত বা ঐতিহ্য এবং আধুনিক জাপানিজ বৌদ্ধবাদ বিশ্লেষণ করলে 'মানব প্রকৃতির' আন্ত:সম্পর্কের একটি প্রতিফলন রয়েছে বলা যায়। যা 'স্থান ভিত্তিক' এবং'জ্ঞাতি কেন্দ্রিক' উভয়ই প্রকাশ পায়।

এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক নাকি অমানবকেন্দ্রিক:

পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে মূলত পরিবেশের প্রতি দায়বোধ, সচেতনতা এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। পরিবেশবাদী চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন, পরিবেশ নীতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি মানুষের বর্তমান আচরণকে সংশোধন করা সম্ভব হবে। অন্যকথায়, প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি শাখা হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষ ও তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান নৈতিক সম্পর্কের পদ্ধতিগত পঠন-পাঠন যেখানে মানুষের সাথে পরিবেশের সম্বন্ধ, পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব, এই দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ প্রভৃতি বিবেচ্য। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণকে মূল্যায়ন করে, কতিপয় নৈতিক নিয়মকে স্বীকার করে এবং এসব নীতি কি, কার প্রতি প্রযোজ্য, এ ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি, এছাড়া পরিবেশের বিভিন্ন অংশের প্রতি এসব নীতি কিভাবে প্রযোজ্য হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।দার্শনিকরা ইতোমধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যা তত্ত্বের দুটি পার্থক্য করেছেন। একটি হলো মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব এবং অন্যটি অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব।

মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বঃ

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের সম্পৃক্ততায় মানবকেন্দ্রিক ভাবনাকে ‘মানবকেন্দ্রিকবাদ’ বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিধায় স্বত:মূল্যে মূল্যবান এবং একমাত্র মানুষেরই ‘নৈতিক অবস্থান’ রয়েছে। মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রথা মতে কেবল মানুষই স্বাধীন নৈতিক মূল্যধারী। অর্থাৎ মানুষের মানবজাতির সদস্য হওয়াই হলো নৈতিক বিবেচনার অধিকারী হবার শর্ত। মানুষ তাঁর প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের অধিকার রাখে অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে আসে বলেই প্রকৃতি মূল্যবান তবে এ মূল্য সহায়ক মূল্য। মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুসারে প্রকৃতির প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো দায়িত্ব নেই তবে পরোক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। জার্ডিনস যুক্তি দিয়েছেন :

> Anthropocentric (`human centered’) ethics holds that only human beings have moral value. Thus, although we may be said to have responsibilities regarding the natural world, we do not have direct responsibilities to the natural world (Jardins 1997: 10).

মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সবল মানবকেন্দ্রিক ভাবনা এবং দুর্বল মানবকেন্দ্রিক ভাবনা, এই দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।পরিবেশের প্রতি মানুষের পরোক্ষ নৈতিক দায়িত্ববোধ নৈতিকতার এই বিস্তৃতি ঘটে দুর্বল মানবকেন্দ্রিক ভাবনায়। সম্পদ সংরক্ষণ, পারমাণবিক বর্জ্য অপসারণ এসব প্রেক্ষিতের আলোচনা দুর্বল মানবকেন্দ্রিকবাদকেই ইঙ্গিত করে। মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে বৈরীমূলক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পিছনে মানুষের কোন প্রবণতা কাজ করছে বা এর কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে সবল মানবকেন্দ্রিকতা ভাবনার কথা উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য সবল মানবকেন্দ্রিকতা তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে পাশ্চাত্য ধর্ম ভাবনা, দর্শন, নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যাইহোক মানবকেন্দ্রিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী কেবলমাত্র মানুষের নৈতিক অবস্থান রয়েছে।

যদি প্রশ্ন করা যায় নৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে যথার্থ মানদণ্ড কোনটি? উত্তর হলো মানব প্রজাতির সদস্য হওয়া; ব্যক্তিসত্ত্বা; বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা প্রভৃতি।ফলে লক্ষ্য করা যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে প্রকৃতি মানুষের উপকারে আসে বলেই তা মূল্যবান তবে সহায়ক। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের জন্য একটি সম্পদ স্বরূপ। প্রকৃতিকে ব্যবহার করা মানুষের জন্য অনৈতিক কিছু না।পাশ্চাত্য পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক নাকি অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব বিরাজ করে তা আলোচনার জন্য অনুসন্ধান প্রয়োজন। যেমন:গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle)মনে করতেন পরিবেশের সকল উপাদান উদাহরণস্বরূপ, গাছপালা, ক্ষুদ্রপ্রাণী এমনকি সকল সদস্য মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।প্রকৃতি জগতের সকল উপাদান মানুষের জন্যই বেঁচে থাকার অধিকার রাখে। প্রকৃতির সকল কিছুকেই মানুষ তার ব্যবহার্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে

পারবে।অর্থাৎ এরিস্টটল মন্তব্য করেন, প্রকৃতি বা পরিবেশের সবকিছু একমাত্র মানুষের জন্যই তৈরি।মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস 'মানব প্রকৃতি'র আন্ত:সম্পর্কের বিষয়টি ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে, ঈশ্বর মানুষের জন্য প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য প্রাণীকে হত্যার ক্ষেত্রে কোনো পাপ নেই।অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণিসমূহকেহত্যা করা মানুষের জন্য অন্যায় নয়। এক্ষেত্রে তিনি তার*Summa Contra Gentiles* গ্রন্থে বলেছেন,

> Consequently, man uses them without any injustice. either by killing them or employing them in any other way. For this reason, God said to Noah: "As the green herbs, I have delivered all flesh to you (David 1997:19).

সুতরাং এরিস্টটল এবং সেন্ট টমাস একুইনাস দুজনই মনে করেন মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী হিসেবে কেবল মানুষেরই নৈতিকতা রয়েছে।পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি বা নৈতিকতা কোনটাই নেই ফলে তারা কোন কিছু নির্বাচন করতে অক্ষম। পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের প্রতি মানুষের যদি কোন দায়িত্ব থেকেও থাকে তাহলে তা মানুষের স্বার্থের নীতির আলোকেই বিবেচিত হবে। এছাড়াও ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্ত এবং সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের দার্শনিক আন্দোলন অস্তিত্ববাদ; যেখানে মানুষের চেতনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তি মানুষেরই সচেতনতা রয়েছে। কেননা নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ড হচ্ছে সচেতনতা(Consciousness)। যার কোনো সচেতনতা নেই তা ভৌত জগতের পদার্থ এবং অন্যান্য প্রাণীরা অস্তিত্বশীল নয়। কারণ অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে। সুতরাং পাশ্চাত্য ধারার চিন্তাবিদগণ মনে করেন, প্রকৃতির নিজস্ব কোন মূল্য নেই কারণ প্রকৃতির যাবতীয় কিছু মানুষের কল্যাণেই তৈরি হয়েছে। মানুষের নিজস্ব স্বত:মূল্য রয়েছে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। পরিবেশ বা প্রকৃতির মূল্য রয়েছে তবে তা সহায়ক মূল্য। অর্থাৎ যা অন্য কিছুর জন্য মূল্যবান হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে কান্টের মত উল্লেখ করব। কেননা এরিস্টটল এবং একুইনাসের মতবাদ থেকে প্রকৃতি মানুষের আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে কান্টের মত কিছুটা বিবেচনাযোগ্য।কান্টকে সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কান্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিলেন। কান্টের শর্তহীন আদেশ তত্ত্ব পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি তাঁর ' *Lectures on Ethics*' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন যে, মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য মানুষের প্রতি আমাদের পরোক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। কান্টের নীতিদর্শন কর্তব্য বিষয়ক নৈতিক মতবাদ এর অন্তর্ভুক্ত। এই মতবাদ অনুসারে "কাজের ভালো-মন্দ নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি বা নৈতিক নিয়মের উপর, ফলাফলের উপর নয়" ।(হামিদ,

২০০১)কান্টের মতে নৈতিক নিয়ম হলো শর্তহীন আদেশ। কোন একটা নিয়ম তখনই নৈতিক নিয়ম হবে যখন এটি শর্তহীন আদেশের মানদণ্ড অনুসরণ করবে। শর্তহীন আদেশ সম্পর্কে কান্ট বলেন-"যে কর্ম নীতিকে বিশ্বজনীন আইনে রূপ দিতে তুমি প্রস্তুত, শুধু সেই কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করো" (হোসাইন ১৯৮৬) ।

কান্টের শর্তহীন আদেশের তিনটি নীতি রয়েছে যার মূলেই রয়েছে মানুষ। নিয়ম তিনটি হলো:

"১ম নিয়ম: মানুষকে সর্বদা উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করে কাজ করো, কখনোই মানুষকে শুধু উপায় হিসেবে গণ্য করে কাজ করো না- মানুষ তুমি নিজে হও বা অপর কোনো মানুষ হোক ।

২য় নিয়ম: এমন কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করো যেন সে কর্মনীতিকে একই সময় বিশ্বজনীন আইনে রূপ দেয়া যায়।

৩য় নিয়ম: এমন কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করো যেন তুমি উদ্দেশ্য রাজ্যের একজন সদস্য" (ওয়াহাব, *কান্টের নীতি দর্শন*)

উপর্যুক্ত তিনটি নীতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কান্ট মানুষকেই নৈতিক কর্তা হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি এমন একটা জগতের কথা বলেছেন যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। কান্টের নীতিদর্শন পরিবেশ-নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে 'বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তা কেন্দ্রিক' নৈতিক মতবাদের ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ কান্ট তার নীতিদর্শন বুদ্ধিবৃত্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষই কেবল নৈতিকভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সুতরাং কান্টের মানবকেন্দ্রিক দর্শনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ কিন্তু তিনি শুধু মানুষশ্রেণির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেননি। কেননা তিনি বৌদ্ধিক গুণের কথা বলেছেন যা মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করে। তাহলে প্রশ্ন উঠে কতিপয় মানবেতর প্রাণী। যেমন:শিম্পাঞ্জী, ডলফিন তারা কি নৈতিক অধিকার রাখে না? আবার যেসব মানুষ মানসিক বিকারগ্রস্ত বা ভ্রুণ অবস্থায় রয়েছে তারা কি নৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না? অর্থাৎ কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিকতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়।দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতা তত্ত্বে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীরও সংবেদনশীলতার কথা স্বীকার করা হয়। যেমন: পিটার সিঙ্গার প্রাণীর অধিকার প্রশ্নে সবচেয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তার মতে, পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে প্রাণীর নৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু সবল মানবকেন্দ্রিকতা তত্ত্বে শুধুমাত্র মানুষকেই অধিক মর্যাদার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানকালের বিভিন্ন সংকটের মধ্যে প্রধান সংকট হলো পরিবেশ সংকট।দার্শনিকরা অনুসন্ধান করে চলছেন এবং তারা উপলব্ধি করেছেন পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণের মধ্যেই পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণ নিহিত।পরিবেশের প্রতি মানুষের বৈরী আচরণকে দায়ী করা হয়। এই বৈরী আচরণ

পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারা থেকেই উৎসাহিত হয়েছে। কেননা পরিবেশের প্রতি এরিস্টটল, ডেকার্ত, কান্টসহ প্রায় সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক এবং তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিকে সংরক্ষণের দিকে নয় বরং প্রকৃতিকে ব্যবহারের প্রতি বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। জার্ডিনস উল্লেখ করেন,

> ... this tradition[western philosophical tradition] provides as rational for the exploitation and dominance of the natural world and thus has been partly responsible for our present environmental predicament.(Jardins 1997: 93)

বলা যায়,পরিবেশ সংকটের পিছনে শুধু পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারাই নয় বরং পাশ্চাত্য ধর্মীয় ভাবধারাও দায়ী। তবে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব

অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবেশের প্রত্যেক উপাদানের মূল্য রয়েছে। তবে প্রকৃতি মানুষের উপকারে আসে বলে প্রকৃতি মূল্যবান এমনটা নয়। বরং প্রকৃতি নিজে নিজেই মূল্যবান হয়ে উঠে এবং এই মূল্য স্বত:মূল্য। পরিবেশের প্রতি মানুষের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে, পরোক্ষ নয়। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রত্যেক উপাদানের স্বত:মূল্য রয়েছে, প্রকৃতিকে যখন আমরা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের প্রেক্ষিতে মূল্য দেই এবং অন্য কারো উপকারে আসুক বা না আসুক প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে বলে স্বীকার করি। এরূপ অর্থকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব বলা হয়। জার্ডিনস তার গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেন,

> অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ন্যায় প্রাকৃতিক বস্তুরাজিকে নৈতিক মর্যাদা প্রদান করে। নির্দিষ্টভাবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শ নৈতিক সূত্রসমূহের প্রসারণ ও পরিমার্জনা দাবী করে। প্রাণীর নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত এবং বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণ অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার সুপরিচিত বিষয়বস্তু। (Jardins 1997: 10)

অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা রয়েছে এবং সকল উদ্ভিদ ও প্রজাতি সংরক্ষণ করা নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, যা অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জার্ডিনস এর সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, অমানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব একধরনের নৈতিক প্রসার (Moral Extension), যেখানে মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবীয়, অজীবীয় এমনকি পদার্থিক উপাদানও এর অন্তর্ভুক্ত যা নৈতিকভাবে বিবেচনাযোগ্য। নৈতিক প্রসার (Moral Extension) বলতে এখানে অমানব প্রজাতিদের অন্তর্নিহিত

মূল্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ অ-মানব প্রজাতির নৈতিক অধিকার রয়েছে, মানুষের ব্যবহার্য উপকরণ হিসেবে নয়। এ প্রসঙ্গে কালিকট এর মত উল্লেখযোগ্য, "... wild species have intrinsic value in some broader sense, a sense that doesnot require that we attribute rights to them". (Callicott 2000 :145)

কালিকটের মতের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বন্য প্রজাতিদেরও স্বত:মূল্য রয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে প্রজাতিসমূহকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী ভাবা হয়না।প্রাচ্য পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতি ও মানুষকে বিচ্ছিন্ন আলোচনা করা হয়নি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে 'মানব-প্রকৃতি' সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়। যদিও পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারা এবং পাশ্চাত্য ধর্মীয় ভাবধারা 'মানব প্রকৃতি'র আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছে, তথাপি প্রাচ্য পরিবেশ নীতিবিদ্যা এবং সংস্কৃতিতে 'মানুষ ও প্রকৃতি'র আন্তঃসম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি।

এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা কতগুলো নৈতিক মূলনীতি উল্লেখ করে যা এশীয় জনগণ সাধারণত প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অনুসরণ করে। অবশ্যই, পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ হিসেবে এশিয়া বিচিত্র এবং এর একক নীতিবিদ্যা আছে কিন্তু প্রভাবশালী নয়। কিন্তু দুটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আমরা প্রভাবশালী হিসেবে আলোচনা করি, এটি এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার দৃষ্টিতে বিবেচনাযোগ্য যেমন- ভারতীয় সংস্কৃতি এবং চৈনিক সংস্কৃতি। এই দুটি সংস্কৃতি থেকে লোকজন মানব-প্রকৃতির সম্পর্ককে ভিন্নভাবে দেখেনা। সম্ভবত,তারা পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে ভিন্নভাবে অনুসরণ করে না। এই পরিবেশ নীতিবিদ্যা এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন- থাইল্যান্ড, কোরিয়া, তাইওয়ান এবং নেপালের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের উপ-বিভাগ থেকে মানবকেন্দ্রিকএবং অমানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার পার্থক্য আছে। এখানে বিভিন্ন ধরণের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন- সত্তাতাত্ত্বিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ রয়েছে। তাছাড়া মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান ধারণা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের জন্য ফলিত হওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে সত্তা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকতর স্পষ্টত সংস্করণ হলো 'পরিবেশগত নীতিবিদ্যা এবং দর্শনের জ্ঞানকোষ' উপস্থাপন করা। (Talukder 2018: 58.)

সুতরাং অমানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা হয় মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার বিপরীত। মানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা সত্তা তাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষ এবং প্রকৃতির এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। অমানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যা সত্তাতাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য তৈরি করেনা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- অমানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতির প্রতি মূল্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানব জাতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

কনফুসিয়ান ঐতিহ্যে নৈতিকভাবে কিভাবে মানব প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির পার্থক্য করা হয় এবং কিভাবে তারা একটি সঙ্গতিপূর্ণ জীবন পরিচালনা করতে পারে এটি হলো কনফুসিয়াসের মৌলিক প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে সে মানব সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা দুর করতে চায়, শান্তি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।কনফুসিয়াস বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী শুরুতেই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল এবং মানুষ লি(Li)এবং সি (Chi) এর ভারসাম্য দ্বারা প্রাকৃতিক সংহতি রজায় রাখত। একদা প্রকৃতির এই সংহতি ধ্বংস হয়েছিল, নৈতিকতার চ্যুতি, প্রকৃতির ভারসাম্যতার চ্যুতি হিসেবে দেখা হয়। তাছাড়া, মানুষ এবং প্রকৃতির দিক থেকে এখানে কোনো সত্তা তাত্ত্বিক পার্থক্য নেই। যারা প্রকৃতির এই ভারসাম্য অর্জনেব্যর্থ হয়, তারা তাদের ব্যক্তিগত, সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থ হবে। (Talukder 2018, 58)

তাই, মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি নেই অথবা তারা কোন উচ্চধরনের নীতি (Li)'র চেয়ে অন্য প্রাকৃতিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রকৃতির ধারাবাহিকতার পরিবর্তে কনফুসিয়ান ঐতিহ্যগুলো অন্য প্রতিরূপ সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ট জ্ঞাতি সম্পর্কগুলোকে বজায় রাখে এবং এটি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে, প্রত্যক্ষরূপে অন্যান্য চিন্তাবিদগণ বলেন যে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশ নীতিবিদ্যায় একটি মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রদর্শিত হয়, যেহেতু প্রকৃতির সবকিছুই সর্বোচ্চ 'আত্মা'র অন্তর্ভুক্ত এবং সব ধরনের বিভেদ অদৃশ্য। তাছাড়া সর্বোচ্চ 'আত্মা' অথবা 'স্বয়ং' নিজ সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রধান পুরোহিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর অবদান লক্ষ্য করা যায় তাই ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে পুরোপুরিভাবে মানবকেন্দ্রিকতাকেএড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণআত্মা, প্রকৃতি এবং মানুষ হলো একক সৃষ্টি সংক্রান্ত ঐক্য,যেখানে জ্ঞাতি সম্পর্ক হয় তাদের মধ্যে প্রাধান্যপূর্ণ।

সুতরাংবিবেচনার বিষয় যে, এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক নয় আবার অমানবকেন্দ্রিকও নয়। বলা যায় এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা 'স্থান-ভিত্তিক' এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' কারণ জ্ঞাতি সম্পর্কগুলো শুধুমাত্র সমতাভিত্তিক অথবা সত্তাতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতাকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে না, তারা 'অনুভূতি সংক্রান্ত বন্ধন' এর সাথে স্থানকে নিশ্চিত করে যা অতিরিক্ত পারস্পরিক সম্মানকে নির্দেশ করে। এই 'অনুভুতিসংক্রান্ত বন্ধন' কে অবশ্যই উপেক্ষা করা যায় না (Talukder 2018 :60)।

বিশ্বব্যাপী বাস্তুবিদ্যক সংকট দুর করার উদ্দেশ্যে আমাদের অধিবিদ্যার প্রয়োজন। এই অধিবিদ্যা হলো মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অধিবিদ্যা থেকে ভিন্ন যেখানে মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক নয়এবং একটি ঘনিষ্ট, অনুভূতিমূলক এবং স্থানভিত্তিক উপায় অনুসরণ করে। এশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে হাজার বছরের পুরনো এবং প্রকৃতির সাথে সাহচর্য্যের একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের প্রতি এই মনোভাব

স্থানান্তর হওয়ার উত্তম উপায় হলো শিক্ষা। সমসাময়িক পরিবেশবাদী দার্শনিক হোম্‌স রলস্টন সংক্ষিপ্তসার করেছেন যে, “The Eastern views offered are typically both old and religious. The Western problem is recent and para scientific.” (Rolston III 1987: 172).

তার মন্তব্য দুইটি দিক থেকে লক্ষ্যণীয়,প্রথমত, এশীয় পরিবেশগত মূল্য হয় যথেষ্ট পুরনো এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মধ্যে সমসংস্থানভুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এশীয় পরিবেশগত নীতিগুলো প্রকৃতির পবিত্রতার ভিত্তি যেটি পরিপূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় ধারণা যেমন- বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি এটি গ্রহণ করতে পারেনা। যাইহোক, এই উভয় দাবী শুধুমাত্র আংশিকভাবে বৈধ। প্রথম বক্তব্যের অর্থ হলো, পুরোনো মূল্য পরিত্যক্ত অনুমিত হবে এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যের বেশ অগ্রসর হওয়া উচিত। অথচ, আমরা সবসময় ধারাবাহিকভাবে এই অভিমত অনুসরণ করব না। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবেশিত্বের ধারণা হয় প্রাচীন মূল্য কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত আমরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সমন্বয়পূর্ণ সহঅবস্থানের জন্য এটাকে মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। খাতির অথবা নৈকট্য হলো অন্য আর একটা মূল্য, যা আমরা শুধুমাত্র পরিবারে চর্চা করি না বরং অফিসে, দলগতভাবে এবং মাঝে মাঝে বৈশ্বিক প্রয়োজনে ব্যবহার করি। এশীয় পরিবেশগত নীতিবিদ্যা স্পষ্টত একটি অধিকতর প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর প্রথম দাবীটি হয় অনুপযুক্ত। সমস্যা এটা নয় যে, এশীয় পরিবেশগত মূল্য হয় প্রাচীন কিন্তু অধিকতর, তারা এখন পর্যন্ত মূলধারার নীতিবিদ্যার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।পরবর্তী দাবি হলো যে, ধর্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য অথবা অন্য কথায়, ধর্ম এবং পবিত্রতা হয় চিহ্নিত। এটা আদৌ যথাযথ অভিমত নয়। কারণ অপরিহার্যভাবে পবিত্রতার একটি ধর্মীয় ধারণার প্রয়োজন পড়েনা। অনেক অধার্মিক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে, প্রকৃতির মধ্যে পবিত্রতা আছে। এই সনাক্ত করণের সাথে সম্প্রদায় এবং মানুষের সনাক্তকরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, যখন আমরা সম্প্রদায় নিয়ে কথা বলি তখন আসলে মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে কথা বলি। তাছাড়া, সম্প্রদায়-বনমানুষ, পশু, পাখি এবং প্রকৃতপক্ষে সকল জীবিত প্রজাতির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। সম্ভবত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রসারতা আমাদের সচেতনতা তৈরি করেছে। এই ধারণাকে বিবেচনা করে মনুষ্যত্বের বৃত্তের দিকেই ইঙ্গিত করা হয় (Talukder 2018: 60)।

আলডো লিওপোল্ড এর ভূমি নীতিবিদ্যায় ‘মানব প্রকৃতি’

আলডো লিউপোল্ড ‘*The Land Ethic*’ প্রবন্ধেভূমির প্রতি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত করেছেন। প্রকৃতির প্রতি তার মনোভাব ছিল সংরক্ষণবাদী। তিনি সংরক্ষণ বিষয়টিকে তার ভুমি নীতিবিদ্যার নৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লিওপোল্ড অনুসারে

নীতিশাস্ত্রের ত্রৈমাত্রিক বিভাগ হলো- প্রথমত, ব্যক্তি এবং নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক মোকাবেলা করা, দ্বিতীয়ত, ব্যাক্তি এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং তৃতীয়ত, ভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ককে নীতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা। (Callicott 1989 : 248)

মূলত লিওপোল্ড তার নীতিশাস্ত্রকে একটি শব্দের মধ্যেই সংজ্ঞায়িত করার চেষ্ঠা করেছেন; সেটি হলো 'কমিউনিটি' এবংব্যক্তি, সমাজ ওপরিবেশগত নীতিবিদ্যাকে 'Biotic community' দ্বারা প্রসারিত করেন। যেখানে মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ প্রকৃতির আরো অনেক কিছুর সঙ্গে মানুষ এবং ভূমির এক ধরণের 'symbiotic' সম্পর্ক বিরাজ করে। লিওপোল্ড বলেন,

> All ethics so far evolved rest upon a single premise: that the individual is a member of a community of interdependent parts...The land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals or collectively: the land. (Callicott 1989: 248)

লিওপোল্ডের ভাষায় মানুষ এবং ভূমির সম্পর্কের একটি সংহতিপূর্ণ অবস্থার প্রতি তার ভূমি নীতি পুন:সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে যা আমরা 'বাস্তুবিদ্যক ন্যায়বোধ'(ecological conscience) দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি। তার বাস্তুবিদ্যক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হলো তিনি ভূমি নীতিশাস্ত্রকে 'ভূমি নান্দনিকতা'(Land aesthetics)হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার এই উপলব্ধি ভূমি ও মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ বা চেতনা জাগ্রত করে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করে তা লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার আলোকে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ তিনি ভূমি বা প্রকৃতির প্রতি নৈতিক ইস্যু তুলে ধরেছেন।

মূল্যায়ন

এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক বা অমানবকেন্দ্রিক কোনটাই নয়। তাহলে এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় কোন ধরনের নীতিবিদ্যা বিরাজ করে। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো তিনটি সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত হয়েছে তা হলো 'স্থান-ভিত্তিক' এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক'।

চৈনিক সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় বিষয় হলো তারা ভূমি বা স্থানকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে তাদের অবস্থানগত সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করে। এছাড়া চৈনিকরা পূর্ব পুরুষদের নিয়ম নীতি, রীতি, কৃষ্টি-কালচার, আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করে।প্রকৃতির সাথে তাদের একধরণের 'অনুভূতিমূলক ঐক্য' লক্ষ্য করা যায়।

চৈনিক সংস্কৃতিতে কনফুসিয়াসবাদ এবং তাওবাদের পারস্পরিক সমন্বয়পূর্ণ নতুন মতবাদ হলো নব্য কনফুসিয়াসবাদ।যেখানে প্রাকৃতিক বিশ্বের গতিশীল পরিবর্তন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয়। নব্য কনফুসিয়াসবাদের প্রভাব বিস্তারকারী চিন্তাবিদ হলেন সু-চি (Chu-Hsi)। উল্লেখ্য, নব্য কনফুসিয়াসবাদী চিন্তা বর্তমান বাস্তুবিদ্যক উদ্বিগ্নের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রথমত, প্রকৃতিবাদী সৃষ্টি তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, স্ব-অনুশীলন(Self-cultivation) (Callicott, 1989)। উভয়ই ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। চৈনিক ঐতিহ্যে চৈনিক চিন্তা-চেতনার অগ্রসর হয়েছে নব্য কনফুসিয়াসবাদ দ্বারা। এখানে মানুষ এবং প্রকৃতিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃতির সাথে মানুষের এক ধরণের পরিবারের সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবারে যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে চমৎকার আত্মিক সম্পর্ক বিরাজ করে ঠিক তেমনি করে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ফুটিয়ে উঠেছে চৈনিক ঐতিহ্যে। চৈনিক ঐতিহ্যে প্রকৃতিকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করা হয়, যেমনটি পরিবারের সদস্যদের সম্মান বা শ্রদ্ধা করা হয়। প্রকৃতির সাথে মানুষের গতিশীল প্রাণবন্ততার সহজাত সম্পর্ককে চৈনিক চিন্তাবিদ Wang Fu-Chihতার নিম্নোক্ত বক্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন,

> The fact that the things of the world, whether rivers or mountains, plants or animals, those with or without intelligence, and those yielding blossoms or bearing fruits, provide beneficial support for all things is the result of natural influence of the moving power of material force. (Callicott 1989 : 141-142).

কনফুসিয়াসবাদ ও নব্য কনফুসিয়াবাদ উভয় ক্ষেত্রে Self-cultivation এবং Dynamicsএর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কনফুসিয়াসবাদ অনুসারে মানুষের অন্তরজগত বা সহজাতরূপে মানুষ বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী। এসব গুণাবলীর চর্চা দ্বারা একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সেই প্রকৃত মানুষ দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠে।আবার ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে বেশি প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। প্রকৃতি থেকে তারা নিজেদের পৃথক বা বিচ্ছিন্ন মনে করে না। ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় সনাতন ধর্মাবলম্বীতে তাদের ধর্মের মধ্যেই প্রকৃতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ বা প্রকৃতির সাথে তাদের সাহচর্য্যপূর্ণ সম্পর্ক বিবেচনাযোগ্য। যা বর্তমান প্রবন্ধের ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনেকটাই বিশ্লেষণ করেছি। কালিকট এর ভাষায়- হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্য একটি একক মতবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এটা হয় একটি জীবন্ত ঐতিহ্য যেটির বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন: ঐশ্বরিক সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্য শুধু একটি মতবাদ নয় বরং একটি মহান অভিমতের বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতির প্রতি মনোভাব।ঋক বেদে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে

আলোচনা রয়েছে, যেখানে প্রকৃতির প্রতি সরাসরি স্তবগান, ভক্তি এবং প্রকৃতিকে দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শঙ্কর ও রামানুজের বক্তব্যেও প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়মানব প্রকৃতির সম্পর্ক অনেকটা আত্মিক। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে কিছু ভারতীয় দার্শনিক প্রাকৃতিক বিশ্বকে হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্যের প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ,আন্না হাজারে পরোক্ষভাবে বাস্তুবিদ্যকপুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েছিলেন। ভারতীয় পরিবেশ বাস্তুবিদ্যক নীতিবিদ্যায় মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীর দর্শন ছিল অহিংসা পরমনীতি। অধিকাংশ পরিবেশ নীতিবিদ স্বীকার করে যে, ভারতীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতির অসংবেদী সত্তার স্বতঃমূল্য রয়েছে। হিন্দু ঐতিহ্য দাবি করে যে, সকল জীবন্ত প্রাণি 'ব্রহ্ম' (Brahman) সামগ্রিকভাবে একই। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এর স্বতঃমূল্য রয়েছে।যেহেতু সকল জীবন্ত প্রাণির মধ্যে 'ব্রহ্ম' বাস করে, এমনকি অ-সংবেদী অস্তিত্বশীল বস্তুসহ সকল প্রাকৃতিক উপাদানের স্বতঃমূল্য রয়েছে। হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্যে এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতীয় পরিবেশবাদী নীতির দিকেই ইঙ্গিত করে। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে ভাবা হয় না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সকল বস্তুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজ করে, যা আত্মিক বা জ্ঞাতি কেন্দ্রিক বলাই শ্রেয়।সুতরাং ভারতীয় বা চৈনিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি হয়েছে যে, এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত প্রকৃতিকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করা হয়েছে। যেমন আমরা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকি।

উপসংহার

সংস্কৃতি হলো একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের জীবন প্রণালী। ঐতিহ্য হলো জীবন এবং প্রকৃতির প্রতি রীতি-নীতি অনুশীলনের মনোভাব যা মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধারণ করে। কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। একই সাথে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বা আচরণ কিরূপ তা নির্ধারণ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে 'মানব প্রকৃতি'র আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সংস্কৃতিতে পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে মানবকেন্দ্রিক এবং অমানবকেন্দ্রিক উভয় মতবাদই প্রতীয়মান রয়েছে। তবে উপলব্ধির বিষয় হলো যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পরিবেশের ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক মতবাদই বিরাজমান। কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীয়মান রয়েছে। কিন্তু প্রাচ্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। এশীয় পরিবেশবাদে বিশেষ করে স্থান বা প্রকৃতির সাথে মানুষের যে সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে তাতে

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 'আবেগ প্রবণ' সম্পর্কের ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে। যেটাকে উপেক্ষা করা যায়না। সুতরাং এশীয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে 'স্থান-ভিত্তিক' এবং 'জ্ঞাতি-কেন্দ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাব্যতা রয়েছে তা বলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

Banerjee, Brojendra Nath. 1979. Hindu Culture Custom and Ceremony. Delhi: Agam Kala Prakashan.

Chattopadhyaya, D.P. 2003. "Indian Perspectives on Naturalism." In *Nature Across Cultures: View of Nature and the Environment in Non-western Cultures*, edited by Helaine Selin, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Coward, Harold. 2003. "Hindu Views of Nature and the Environment". In *Nature Across Cultures: View of Nature and the Environment in Non-western Cultures*, edited by Helaine Selin, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Callicott, J. Baird. 2000. "The Intrinsic Value of Non-Human Species" cited in Norton, Bryan G. "The Cultural Approach to Conservation's Biology" in Benson, John. *Environmental Ethics: An introduction with readings*, London and New York: Routledge.

Callicott, J. Baird and James McRae, 2014. *"Environmental Philosophy inAsian Traditions of Thought*." Albany: State University of New York press.

Jardins, Joseph R. Des. 1997. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, 2nd edn., Albany, NY: Wadsworth publishing company.

Lan- Fung Yu. 1966. '*A short History of Chinese Philosophy'*, New york, London.

Nagarjan, Vijaya. 2000. "Rituals of Embedded Ecologies: Drawing Kolams, Marrying Trees, and Generating Auspiciousness." In *Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky,* and Water, eds. Christopher Key Chapple and Mary Evelyn Tucker, New Delhi: Oxford University Press.

Pepper, David. 1997. *Modern Environmentalism: An Introduction*, London and New York: Routledge.

Rolston, III, Holmes. 1987. "Can the East Help the West to Value Nature?" *Philosophy East and West* 37(2).

Talukder, Md. Munir Hossain. 2018. *Nature and Life: Essays on Deep Ecology and AppliedEthics*, Cambridge Scholars Publishing. UK.

Tao, Julia. 2005. "Relational Resonance with Nature." In *Environmental Values in a Globalizing World: Nature, Justice and Governance*, edited by Jouni Pavola and Ian Lowe, 66-79. Oxon: Routledge.

Taylor, Rodney L. 1998. "Companionship with the World: Roots and Branches of a Confucian Ecology." In *Confucianism and Ecology: The Intersection of Heaven, Earth, and Humans,* eds. Mary Evelyn Tucker and John Berthrong, Cambridge.

Toadvine, Ted. 2007, "Culture and Cultivation: Prolegomena to aPhilosophy of Agriculture." Albany: state university of New York Press.

Weiming, Tu. 1998. "Beyond the Enlightenment Mentality." In *Confucianism and Ecology: The Intersection of Heaven, Earth, and Humans,* eds. Mary Evelyn Tucker and John Berthrong, Cambridge.

ওয়াহাব, শেখ আব্দুল, *কান্টের নীতি দর্শন*, উদ্ধৃত হয়েছেঃ সালেহ, আবু জাফর মোহাম্মদ "প্রকৃতি ও মানুষঃ নৈতিকতা প্রসঙ্গে" *দর্শন ও প্রগতি:* ১৬শ বর্ষ; ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৯।

হামিদ, এম. আব্দুল (২০০১), *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হোসাইন, সৈয়দ কমরুদ্দীন (১৯৮৬), *কান্টের দর্শন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি।